মানসিক রোগ
ও
ভ্রান্ত ধারনা

AUTHOR

ডাঃ অলোক পাত্র

(Neuro Psychiatrist)

স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

M.B.B.S. (Cal.) D.P.M (NIMHANS, Bangalore)
D.N.B. (New Delhi), F.I.P.S., M.I.M.A., F.I.A.P.P.

E-mail : dr.alok.patra@gmail.com

- Consultant :
  Pranabananda Seva Sadan, Psychiatric Nursing Home.
- Ex- :
  National Institute of Mental Health
  & Neuro Sciences, Bangalore.
- Central Institute of Psychiatry, Ranchi
- Ex- Physician :
  Calcutta National Medical College & Hospital.
- Calcutta Pavlov Hospital (Gobra)
- Ex-Visiting Consultant.
  Antara, Baruipur

রোগ সচেতনতা ও রোগাতঙ্ক এক নয় ঃ-

কিছু ব্যক্তি সব সময় শরীর সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সচেতন থাকেন। সামান্য কোনো অসুবিধা হলেই সেটাকে খুব বড়ো করে দেখেন, বড় রোগের আশঙ্কা করেন। কেউ কেউ আবার কথায় কথায় বড় বড় ডাক্তার দেখান। পরীক্ষা নিরীক্ষা করান। রিপোর্ট (Report) নেগেটিভহলেও বিশ্বাস করেন না। ঘন ঘন ডাক্তার বদলান। ওষুধ খেতে চান না নানান সাইড এফেক্ট (side effect) এর ভয়ে। এটিও একটি মানসিক রোগ। একে বলে হাইপোকন্ড্রিয়াসিস (Hypochondriasis)। কারো কোন রোগের কথা শুনলে বা কোথাও রোগ সম্বন্ধে পড়লে বা শুনলে নিজেকে ঐ রোগের রোগী বলে ভাবেন। বর্তমান অবস্থায় সবাই স্বাস্থ্য নিয়ে কমবেশী খবরাখবর রাখেন । সুস্থ অবস্থাতে হেলথ চেক্ আপ (health check-up) করান। কিন্তু এই সচেতনতা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় - অমূলক আতঙ্কের পর্যায়ে চলে যায় তবে তা মানসিক রোগ হিসাবে গণ্য করা হয়।

☛ শরীর আর মন আলাদা নয় ঃ-

অনেকেই প্রশ্ন রাখেন -' ডাক্তারবাবু আমার কষ্টগুলো তো শরীরে - আপনি মানসিক অসুখ বলছেন কেন?' । আবার কেউ কেউ বলেন - 'আমারা তো ভুগছি দুশ্চিন্তায় , হতাশায় , দাম্পত্য বা পারিবারিক সমস্যায় - কষ্ট তো আমার মনে - পেটে ওষুধ খেলে কি করে মনের সমস্যার সমাধান হবে? '। এসবেরই পিছনে কাজ করে যুগ যুগ ধরে লালন করা একটি ভ্রান্ত ধারনা - **'মন আর শরীর দুটি আলাদা সত্তা'** - যেন এদের মধ্যে চীনের প্রাচীর আছে। মন আর শরীর একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা কাঁদলে চোখ দিয়ে জল পড়ে, ভয় পেলে বুক ধড়পড় করে , রাগলে কান মাথা গরম হয়ে উঠে - অর্থাৎ আমাদের আবেগের প্রকাশ শরীরে ঘটে। আবার শরীরের ব্যথা যন্ত্রনা হলে মনে অবসাদ আসে । শরীর কাঁপলে মনে ভয় আসে । মনের অনুভব অনুভূত ব্রেনের ফ্রন্টাল কর্টেক্স (Frontal

Cortex) থেকে লিমবিক সিস্টেম (Lymbic System) হয়ে হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) এ আসে । সেখান থেকে সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক (Sympathetic & Parasympathetic) নার্ভের মাধ্যমে সারা শরীরের নার্ভাস সিস্টেমে (Nervous System) ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাবে মনের প্রভাব শরীরে পড়ে। আবার ঠিক বিপরীত পথে শরীরের প্রভাব পড়ে মনের উপর।

তাই সব অসুখকে মানসিক বা শারীরিক বলে আলাদা করা যায় না। আবার চিকিৎসাতে শুধু মানসিক চিকিৎসা বা শারীরিক চিকিৎসা বলে আলাদা কিছু ভাবা যায় না।

☛ ব্রেন আর মন - একই রেখার দুই প্রান্ত ঃ-

অনেকে প্রশ্ন করেন - 'ডাক্তারবাবু ব্রেনের স্ক্যান তো নর্মাল - তবে রোগী অমন বোধবুদ্ধিহীন অস্বাভাবিক আচরণ করছেন কেন? '। আবার কেউ বলেন 'ওর সমস্ত মুখস্থ পড়া পরীক্ষার আগে হঠাৎ ভুলে গেছে, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেছে - এটাকে মানসিক সমস্যা বলছেন কেন? '। এসব প্রশ্ন জাগার কারন হচ্ছে ব্রেন আর মনের সম্পর্কটা ঠিকভাবে না বোঝা। ব্রেন হোল একটা স্ট্রাকচার (Structure) আর মন হোল তার ফাংশান (function)- অনেকটা কম্পিউটারের Hardware আর Software এর মতো। ব্রেনের বিভিন্ন নার্ভাস সিষ্টেমের (Nervous System) ইলেকট্রিক্যাল (Electrical) ও নিউরো কেমিক্যাল (Neurochemical) ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ কাজ করে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ,শরীর এবং সেই সঙ্গে মন। চিন্তন (Cognition), আবেগ (Affect) ও আচরণ (Behaviour) এই তিনটি মনের প্রধান অস্তিত্ব । ব্রেণের কোনো স্ট্রাক্চারাল ডামেজ (Structural Damage) হলে যেমন - রক্ত জমলে, টিউমার হলে , স্ট্রোক হলে - মনের বিকার দেখা দেয়। ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম হলে মৃগী হয়। আর নিউরোকেমিক্যাল প্রবলেম (Neurochemical

Problem) হলে মানসিক রোগ দেখা দেয় । আবার মনের উপর পরিবেশের চাপ পড়লে তার প্রভাবে ব্রেনের নিউরোকেমিক্যাল (Neurochemical) পরিবর্তন ঘটে।

তাই মানসিক চিকিৎসায় ২ দিক থেকে অগ্রসর হওয়া যায়। ঔষধের সাহায্যে ব্রেনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, আবার সাইকোথেরাপী , কগনিটিভ বিহেবিহার থেরাপী , কাউনসেলিং, ট্রেনিং এর মাধ্যমে মনের পরিবর্তন করে - ব্রেনের নিউরোকেমিক্যাল ডিসঅর্ডার (Neurochemical Disorder) সংশোধন করে।

☛ **স্বজনবিয়োগ ও মনোরোগ ঃ-**

বাবা–মা - সন্তান বা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর ভেঙ্গে পড়া , কান্না, বিলাপ স্বাভাবিক । কিছু দিন ক্ষিদে , ঘুম কমে যাওয়া , গুম মেরে থাকা বা অতিরিক্ত অস্থিরতা হয়। একে বলে গ্রিফ রিঅ্যাক্সান (Grief Reaction। সাধরণত এক থেকে দুই মাস ধরে এটা থাকে । এক বৎসর কাল বিষন্নতা থাকলেও ব্যক্তির ঘুম, ক্ষিদে ,স্বাভাবিক কর্ম জীবন দু মাসের পর থেকেই স্বাভাবিক হয় । এর জন্য সাধারণত কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে গ্রিফ রিঅ্যাক্সান এ চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে — যদি তা

(১) **প্রোলঙ্গড** (Prolonged) হয়–দু মাসের পরেও বর্তমান থাকে,

(২) **ডিলেড** (Delayed) হয় — বিয়োগের সময় কোনো শোক থাকে না অথচ কয়েক মাসে পরে তা প্রকাশ পায় ,

(৩) **কপ্লিকেটেড** (Complicated) হয় — যদি শোক প্রকাশের সাথে অস্বাভাবিক আচরন দেখা যায় — যেমন মৃত্যু, শেষকৃত্যের স্মৃতি ভুলে যাওয়া , রাগারাগী মারামারি করা , উৎফুল্ল হওয়া , অতিরিক্ত আনন্দে থাকা, মৃতের কথার্বাতা শুনতে পাওয়া , নিজেকে মৃত ব্যক্তির রোগে আক্রান্ত বলে মনে করা , নিজেকে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী ভেবে অকারণে বিষন্ন হওয়া ইত্যাদি হয় ।

☛ বার্ধ্যকে স্মৃতিভ্রংশ হওয়া - একটি রোগ ঃ-

বয়স বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমে, অনেকে অস্বাভাবিক আচরন করেন , বাচ্ছাদের মতো পাইখানা পেচ্ছাবের কথা বলতে পারেন না । কাউকে খাইয়ে পরিয়ে দিতে হয়। এটাকে অনেকে স্বাভাবিক পরিণতি বলে ভাবেন। আসলে কিন্তু এটা একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার (Neurological Disorder) — যাকে বলা হয় ডিমেন্সিয়া (Dementia)। ডিমেন্সিয়া অনেক কারণে হয় - তার মধ্যে বেশ কিছু কারণ আছে যেগুলি চিকিৎসা করলে পুরোপুরি সেরে যায়। আর যেগুলি পুরোপুরো সারে না সেগুলির ও চিকিৎসায় কিছুটা উন্নতি ঘটানো যায়। রোগের প্রোগেস (Progress) আটকে দেওয়া যায়। তাছাড়া অনেক সময় ডিপ্রেসান (Depression) ও অন্যান্য মানসিক রোগেও স্মৃতি লোপ পায় । কাজেই স্বাভাবিক পরিনতি না ভেবে স্মৃতি ভ্রংশের চিকিৎসা করানো দরকার - তাতে রোগী পূর্বের জীবন ফিরে পেতে পারেন।

☛ শিশুদেরও হয় মানসিক রোগ ঃ -

বাচ্চাদের মানসিক রোগের কথা বললে অনেকে ভাবেন — বাচ্চাদের আবার মানসিক সমস্যা কি ? ওরা খায় , দায় , খেলে পড়ে— ওদের আবার চিন্তা কিসের ? অথচ বাস্তব সত্য এই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিশুদের মানসিক সমস্যা বড়দের থেকেও বেশী। শিশুরা বেশী অনুভূতি প্রবন হয় - ওদের রাগ, ক্ষোভ , অভিমান , দুঃখ , হতাশা অনেক বেশী গভীর। তবে বাচ্চাদের মানসিক সমস্যা সহজে বোঝা যায় না। বাচ্চার দুরন্তপনা , খেতে না চাওয়া , পড়া শুনায় খারাপ হওয়া, নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাওয়া- সবের পেছনেই থাকে এই সব রাগ ক্ষোভ অভিমান । অনু পরিবার, বাবা-মার কলহ , চাকুরীজীবি বাবা-মা, অতিরিক্ত পড়ার চাপ, অতিরিক্ত টিভি দেখার চাপ ইত্যাদি বাচ্চাদের মানসিক রোগী করে তোলে। তাই বাচ্চার আচার আচরণ স্বাভাবিক মনে না হলেই মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

☛ **দাম্পত্য সমস্যা — মনোচিকিৎসার আওতায় পড়ে ঃ-**

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বাদ, বিবাদ, কলহ, অশান্তি কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে—অথবা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অনেকে এ অবস্থায় সেপারেশান (Separation) বা ডির্ভোস (Divorce) এর দিকে এগোন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দম্পতির মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকার যথেষ্ট উপাদান থাকা স্বত্তেও কলহ বাঁধে কয়েকটা ভুল পদক্ষেপের জন্য । অনেকেই বলেন - যে স্বামী স্ত্রীর সমস্যা তাদের নিজেদের মেটানো উচিত - অন্য কারুর মাথা গলানো ঠিক নয় । কিন্তু সব সময় নিজে নিজে সমাধান বের করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সাইকিয়াস্ট্রিস্ট (Psychiatrist) সাইকোলজিস্ট (Psychologist) ও সাইকিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ারকার (Psychiatric Social Worker)— ম্যারিটাল থেরাপীর (Marital therapy) মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন। সঙ্গে যৌন সমস্যা থাকলে সেক্সুয়্যাল থেরাপী (Sexual Therapy) করেন।

☛ **সম্পর্কজনীত সমস্যাও মানসিক চিকিৎসার আওতায় পড়ে ঃ-**

পরিবারের বিভিন্ন ব্যাক্তির মধ্যে যেমন বাবা - মার সঙ্গে ছেলে ; শ্বশুর, শ্বাশুড়ীর সঙ্গে বৌমার ; বা যে কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীযের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হলে— এবং তার পরিনামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন , কর্ম জাগতিক জীবন এবং সামাজিক জীবন বিঘ্নিত হলে তখন তা মানসিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। কাউনসেলিং (Councelling) ,ক্রাইসিস ইন্টারভেনসান (Crisis Intervention) , সাপোর্টিভ থেরাপী (Supportive Therapy) এবং ফ্যামিলি থেরাপীর (Family Therapy) মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়।

☛ **অকুপেশন্যাল অ্যাড্জাষ্টমেন্ট সমস্যা— মনো চিকিৎসার আওতায় পড়ে ঃ-**

কাজের জায়গায় মানিয়ে নিতে না পারা , বস বা কলিগের সাথে অ্যাডজাষ্ট করতে না পারা , কাজের চাপ সইতে না পারা, জব স্যাস্টিসফেকসান

(Job Satisfection) না থাকা ইত্যাদি সমস্যাকেমানসিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হয়; এবং মনো চিকিৎসায় কাউনসেলিং , সাইকো থেরাপী, সোস্যাল স্কিল ট্রেনিং ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

☛ **সামাজিক,ধর্মীয় আধ্যাত্বিক - অ্যাডজাস্টমেন্ট সমস্যা - মনোচিকিৎসার আওতায় ঃ-**

সামাজিক নিয়মের সাথে ব্যাক্তিগত ভাবনার , বিশ্বাসের দ্বন্দ হলে , এক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন সংস্কৃতিতে গিয়ে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হলে, নিজের যুক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মীয় রীতিনীতির বিরোধ হলে , ধর্মান্তরকরনজনীত সমস্যা হলে , আত্মাধিক ভাবনা অনুভবের সাথে বাহ্যিক জীবনধারনের সাযুয্য না হলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তা সবই মানসিক সমস্যা বলে গণ্য করা হয় এবং মনোচিকিৎসায় সমাধান করা হয়।

☛ **জ্ঞান , মনোভাব , প্রয়োগ (Knowledge , Attitude, Practice) (KAP) ও মনোচিকিৎসা ঃ-**

Knowledge (K) - জ্ঞান বা ধারনা, Attitude (A) - মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি Practice (P) - ব্যবহার বা জ্ঞান- দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আচার আচরণ। এই তিনটি বিষয়ে অনেকেরই সামঞ্জস্য থাকে না, যেমন অনেকেই জানেন যে ধূমপান ক্ষতিকারক (K), ধূমপান অন্যকে করতে নিষেধ করেন (A) অথচ নিজে ধূমপান করেন (P)। AIDS - সাধারণত ছোঁয়াছুয়িতে ছড়ায় না(K)। AIDS রোগীকে অচ্ছ্যুৎ ভাবা উচিত নয় (A) জেনেও অনেকের কাছে AIDS রোগী এলে দশহাত দূরে সরে যান (P)। আবার সবধর্ম সমান জানেন (K), নিজেও ভিন্ন ধর্মীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন (P) অথচ ভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কে আলোচনায় বিরূপ মন্তব্য করেন (A)। মানসিক রোগী মানেই পাগল নয় - অনেকেই জানেন (K) - তবু নিজের রাগ মানসিক বললেই মানতে চান না (A) , চিকিৎসা নিতে চান না - ভাবেন

'তাহলে কি আমি পাগল?' (P)। আবার বাচ্চার দুরন্তপনার জন্য, ছেলের পরীক্ষাভীতির জন্য মনোচিকিৎসকের কাছে যান (P) - অথচ বন্ধু মনোচিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে পাগল গোত্রীয় বলে ভাবেন (A)। সাধারণ মানুষের এই সব মানসিকতার পরিবর্তন না হলে চিকিৎসা ব্যবস্থার যতই উন্নতি হোক সমাজ তার সুফল পাবেন না। Tb রোগের চিকিৎসা থাকা স্বত্বেও, সরকারী বেসরকারী ভাবে তা সহজলভ্য করা সত্ত্বেও দেশের হাজার হাজার লোক এখনও Tb রোগে ভোগেন, মারা যান - শুধুমাত্র এই মানসকিতার পরিবর্তন না হওয়ার জন্য। মানসিক চিকিৎসার প্রসার ঘটাতে গেলে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই মানসিকতার পরিবর্তন।

☛ এ্যালায়েনিষ্ট বনাম সাইকিয়াস্টিষ্ট (Alienist vs Psychiatrist) - একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেন্জ ঃ-

মনোচিকিৎসার উন্নতির আগে ১৯০৯ সালে ভারতে প্রথম মেন্টাল অ্যাসাইলামের দায়িত্ব সিভিল সার্জেনের হাত থেকে একজন এ্যালায়েনিস্ট (Alienist) এর হাতে দেওয়া হয়। সে সময় সাইকিয়াট্রিস্ট কে এ্যালায়েনিস্ট নামেই ডাকা হতো- যেহেতু সাইকিয়াট্রিস্ট চিকিৎসার অন্য সব বিভাগের চিকিৎসক থেকে আলাদা থাকতেন। মানসিক রোগকে আধুনিক চিকিৎসার বাইরে এ্যালায়েন (Alien) এবং মনোচিকিৎসককে চিকিৎসক গোষ্ঠীর বাইরে এ্যালায়েনিস্ট (Alienist) ভাবনার পরিবর্তন ঘটাতে ১৯৩৩ সালে ডঃ গিরিন্দ্রশেখর বোস আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজে সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টের ইনডোর খোলেন। তারপর বহু চিকিৎসক মেডিক্যাল সায়েন্সের অনান্য বিভাগের সাথে সাইকিয়াট্রিকে মেলানোর বহু চেষ্টা করলেও আজও সাইকিয়াট্রিস্টরা এখনো অনেকের কাছে এ্যালায়েনিস্ট (Alienist)। এখন মনো চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রের আর পাঁচটা বিভাগের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ন। যত গবেষণা এগোচ্ছে ততই মানসিক রোগের অধ্যায় শারীরিক রোগের থেকে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রাচীন ধারণার লোকজন, এমনকি কিছু চিকিৎসকও আজও খোলা মনে এই সত্যটা

মেনে নিতে পারছেন না । ফলে মানসিক চিকিৎসার প্রসার পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। মাথা ছাড়া যেমন শরীরের অস্তিত্ব নেই , মন ছাড়া যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই , তেমনি সাইকিয়াস্ট্রি ছাড়া মেডিক্যাল সায়েন্স অসম্পূর্ন - এই কথা হৃদযঙ্গম করতে যে সমাজ যত দেরী করবে - আধুনিক জীবন সেই সমাজ থেকে ততই দূরে থেকে যাবে।

☛ সুস্বাস্থ্য এর অর্থ - কেবল রোগমুক্ত শরীর নয় ঃ -

স্বাস্থ্যবান বলতে আমরা যার রোগ নেই এবং মোটাসোটা লোক বুঝি। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে সুস্বাস্থের সংজ্ঞা অন্য। WHO এর দেওয়া সুস্বাস্থের সংজ্ঞা - সুস্বাস্থ্য হোলো শারীরিক মানসিক ও সামাজিক সুস্থবোধ- এক কথায় সার্বিক সুস্থবোধ ; কেবলমাত্র রোগ বা পঙ্গুত্যমুক্ত অবস্থা নয় ।

সুস্বাস্থ্যের অনেক গুলো ডায়মেনসান আছে -সেগুলি হোলো -

a) ফিজিক্যাল ডায়মেনসান (Physical Dimention) ঃ -

শারীরিক সুস্থতার লক্ষন হোল উজ্জ্বল চোখ, চকচকে চু ল , পেশীবহুল মেদ বর্জিত দেহ বা চেহারা, দুর্গন্ধমুক্ত শ্বাস,পরিমিত ক্ষুধা , পর্যাপ্ত ঘুম , নিয়মিত পরিস্কার পাইখানা ও প্রসাব , সচ্ছন্দ স্বনিয়ন্ত্রিত শারীরিক চলনবলন।

b) মেন্টাল ডায়মেনসন (Mental Dimention) ঃ -

সুস্থ মন ছাড়া সুস্থ শরীর হয় না । সুস্থ মন মানে কেবল মানসিক রোগমুক্ত মন নয়। সুস্থ মনের বৈশিষ্ট্য গুলি হোলো -

১) অর্ন্তদ্বন্দ্ব মুক্ত মন - নিজের সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত নয় ।

২) অন্যের সাথে ভালো অ্যাডজাস্টমেন্ট - সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারা ; সমালোচনা সহ্য করতে পারা ; সহজে আবেগতাড়িত না হওয়া ইত্যাদি ।

৩) আত্মসন্ধানী মন - নিজের সোসাল ইমেজের সম্বন্ধে সচেতন থাকা।

৪) আত্ম মূল্যায়নে সন্তুষ্ট ঃ

৫) নিজের চাহিদা সমস্যা উচ্চাকাঙ্খা সম্বন্ধে সচেতন থাকা।

৬) আত্মনিয়ন্ত্রনে সক্ষম - যুক্তি এবং আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারা।

৭) জীবনের সমস্যা মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত থাকা- বুদ্ধিও দক্ষতার সাথে টেনশান ও চাপের মোকাবিলা করতে পারা।

c) **সোস্যাল ডায়মেনসান** (Social Dimention) ঃ

নিজের বিভিন্ন সত্তার মধ্যে সংহতি রাখা; অন্য ব্যক্তির সাথে, নিজের সমাজের সবার সাথে, সারা পৃথিবীর সবার সাথে সৌহার্দ্য পূর্ন্য সংযোগ রাখা - সামাজিক সুস্থতার লক্ষন।

d) **স্পিরিচুয়াল ডায়মেনসান** (Spiritual Dimention)ঃ

জীবনের অর্থ ও লক্ষ্যের খোঁজে জ্ঞান আহরণ ও আত্মবীক্ষন - আধ্যাত্মিক সুস্থতার লক্ষন ।

কাজেই সুস্বাস্থ পেতে শুধু কিছু ভ্যাক্সিন নেওয়া; প্রেসার ,সুগার , কোলেস্ট্রেরল নিয়ন্ত্রনে রাখা ; ওজন বাড়ানো কমানো নয় — আরো আরো অনেক কিছু - যা পাওয়ার জন্য একজন মানুষকে জীবনভোর চেষ্টা করে যেতে হয়।

☛ লাইফ স্টাইল পাল্টানো - আধুনিক চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ ঃ-

সাধারণতঃ চিকিৎসা বলতে আমরা বুঝি ঔষধ খাওয়া ও সঙ্গে কিছু পথ্য নেওয়া । অনেকে বোঝেন সুস্থ থাকাকালীন - মাঝে মাঝে হেল্‌থ চেক আপ । কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ঔষধ পথ্য ও চেক আপ ছাড়াও সুস্থ থাকার জন্য আরও কিছু করনীয় জিনিস-এর উপর গুরুত্ব দেন । তারমধ্যে একটি হল লাইফ স্টাইল পাল্টানো। বয়স ওজন রোগ অনুযায়ী খাদ্যতালিকার পরিবর্তন রোগ প্রতিরোধ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া নিয়মিত কিছু শারীরিক পরিশ্রম , ব্যায়াম , খেলাধূলা প্রয়োজন সব বয়সের মানুষের জন্য - বিশেষ করে যারা বসে কাজ করেন তাদের এবং গৃহিনীদের জন্য । ধ্যান , মেডিটেশন , যোগাসন , রিলাক্সসেশান এক্সাসাইজ প্রয়োজন উদ্বেগ ও বিষন্নতা কমানোর জন্য । মদ , চা , সিগারেট ব্যবহারে মাত্রা রাখা প্রয়োজন। নিজের শরীর এবং মানসিক অবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে কাজের বোঝা নির্দিষ্ট করা উচিত। অতিরিক্ত উচ্চাশা ,প্রতিদন্দ্বীতা ও অনান্য স্ট্রেস বর্জন সুস্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন ।

☛ মোটা হওয়া আতঙ্ক - একটি মানসিক রোগ ঃ-

মোটা হওয়া বা ওজন বেড়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভোগেন অনেক কিশোর কিশোরী বিশেষত কিশোরী। ফলে খেতে চান না। একটার পর একটা খাওয়ার ছাড়তে ছাড়তে একেবারে অনাহারে থাকেন। ক্রমশঃ রোগা হতে হতে শীর্ণ হয়ে যান। খাওয়ার অভ্যাস চলে যাওয়ার ক্ষুধার অনুভবও চলে যায় অনেককেরাইলস টিউব ফিডিং বা আই. ভি ফ্লুইড Ryle's Tube feeding Or I V fluid দিতে হয়। মারাও যান কিছু রোগী এই রোগে। এই রোগের নাম এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা (Anorexia Nevrosa)। মূল সমস্যা হোল এই রোগী শীর্ণকায় হলেও তার মন থেকে সে মোটা বা মোট হয়ে যাবে এই ভয় তাড়ানো যায় না। এই রোগেরই উল্টোপিঠ বুলিমিয়া নার্ভোসা (Bullimia Nervosa। এই রোগে রোগী অতিরিক্ত খান। খাওয়ার পরেই

মোটা হওয়ার ওষুধ খান। অতিরিক্ত খাওয়া, খেয়ে বমি বা পাইখানা করে ওজন কমানোর চেষ্টা - এই নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত বা মগ্ন থাকা এই রোগের বৈশিষ্ট্য।

☛ **অখাদ্য খাওয়া - একটি মানসিক রোগ ঃ-**

খাওয়ার নয় এমন জিনিস অনেকে খান। মাটি, ছাই, চক, সিমেন্ট, বালি, কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি খান। এই সব খাওয়ার কারনে - পেটের গন্ডগোল, কৃমি, রক্তাল্পতা ইত্যাদি রোগ হয় । একে বলে পাইকা (Pica)।

অখাদ্য নয় তবে সুস্বাদু বা পুষ্টিকর নয় এমন জিনিস অনেকে খান - যেমন কাঁচা সরষে, চাল, গাছের পাতা, আনাজের খোসা ইত্যাদি। একে বলে সিসা (Cissa)।

রাস্তা থেকে নোংরা কুড়িয়ে খান সাইকোসিস বা স্কিজোফ্রিনিয়া রোগী। কেউ কেউ পাইখানা খান - যাকে বলে কপ্রোফেজিয়া (Coprophegia।

নিজের মূত্র খান অনেকে মানসিক রোগে। কেউ কেউ নিজের জটিল রোগ সারানোর জন্যেও স্বীবাম্বু বা স্ব মূত্র পান করেন কুসাংস্কারের বশে। মৃত মানুষের মাংস খান যৌন বিকৃতির রোগী ও স্কিজোফ্রেনিক রোগী - যাকে বলে (Necrophegia)।

☛ **এ. ডি . এইচ . ডি (ADHD) — বড়দের ও হয় ঃ-**

ADHD সাধারনত ছোটোদের মধ্যে দেখা গেলেও - কিশোর কিশোরী ও বড়দের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়। বড়দের ADHD এর লক্ষনগুলি নিম্নরূপঃ

a) **মোটর হাইপার এ্যকটিভিটি** (Motor Hyperactivity) ঃ

অস্থিরতা, ছট ফট করা, রিলাক্স (relax) না হতে পারা, ধৈর্য্য করে টিভি দেখতে না পারা, খবরের কাগজ বা বই পড়তে না

পারা, সব সময় এখান ওখান হওয়া, স্থির হলেই বিষন্ন হয়ে পড়া ইত্যাদি হয়। ঃ

b) **এ্যাটেনশান ডেফিসিট** (Attention Deficit)ঃ

অন্যমনস্ক হওয়া, পড়া বা কাজের সময় আশেপাশের বিষয়ে মন চলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া, চাবি, মানিব্যাগ জিনিসপত্র বেজায়গায় রাখা, এ্যাপোয়ন্টমেন্ট , প্ল্যান (Appoitment, Plan) ভুলে যাওয়া ইত্যাদি হয়।

c) **অ্যাফেকটিভ লেবিলিটি ঃ** (Affective Lability) :

অল্প সময়রে জন্য বিষন্ন হয়ে পড়া, আবার কিছুক্ষণ পরেই মাত্রাতিরিক্ত উল্লাস বা আনন্দ অনুভর করা ।

d) **এঙ্গার আউটবার্স্ট ঃ** (Anger Outburst) ঃ হঠাৎ হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, মাথা গরম করা- আবার খুব শীঘ্রই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।

e) **ইমোশনাল হাইপারএ্যাকটিভিটি ঃ—** (Emotional Hyperactivity) ঃ ছোটো খাটো বিষয়ে বেশী উদ্বেগ, রাগ ক্ষোভ অভিমান হওয়া। রোজকার কাজকেই বিশাল ভারবোঝা বা মানসিক চাপের বিষয় ভাবা।

f) **ডিসঅর্গানাইজেশান** (Disorganisation)ঃ

গুছিয়ে কাজ করতে না পারা, পরিকল্পনা করে কাজ করতে না পারা, সময়ের মধ্যে পড়া কাজ শেষ করতে না পারা।

এই ধরনের সমস্যাকে অনেক সময় বর্ডারলাইন পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার, মুড ডিসঅর্ডার, ইমপালস কন্ট্রোল ডিসঅর্ডার মনে হয় - যদিও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে তফাৎটা বোঝা যায়।

বড়দের ADHD তে ছোটোদের মতো Methylphenidate, Atomoxetetine, SSRI ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

☛ খিঁচুনী ছাড়াও মৃগী হয় ঃ-

অধিকাংশ লোকের ধারনা যে মৃগী মানেই খিঁচুনী হওয়া। তাই খিঁচুনী নেই এমন রোগীকে মৃগী রোগ বললে বিশ্বাস করেন না। আসল সত্য হোল মৃগী বহুপ্রকারের হয় এবং মৃগীর অনেক প্রকারে খিঁচুনীর বদলে অন্য লক্ষন দেখা দেয়। মৃগীর লক্ষন গুলি নিম্নরূপ ঃ

a) অ্যাবসেন্স ফিট (Abscence Fit) ঃ

বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকা, হঠাৎ করে চুপ হয়ে যাওয়া, হাত থেকে জিনিস পড়ে যাওয়া, শরীরের ঝাঁকুনী হওয়া, হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া, ঠোঁট কামড়ানো বা খাবার চিবানোর মতো মুখ নাড়া ইত্যাদি হয়। এটি 10-15 Seconds এর জন্য হয়। পরক্ষনেই রোগী স্বাভাবিক হয়ে যান এবং আগে যা করছিলেন তাই করতে থাকেন। ওই সময়ের কথা মনে থাকে না। দিনে 2 – 200 বার পযর্ন্ত এই রোগ দেখা দিতে পারে।

b) প্যারসিয়াল বা ফোকাল ফিট ঃ (Partial or Focal Fit) ঃ

এই ধরনের মৃগীতে রোগীর জ্ঞান সম্পূর্ন থাকে, শুধু শরীরের একটা অংশে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা অস্বাভাবিক অনুভুতি বার বার হতে থাকে। যেমন ঘাড় বেঁকে যাওয়া, মুখ বেঁকে যাওয়া, এক হাতে ঝাঁকুনী হওয়া এবং শরীরের এক পাশে খিঁচুনী হওয়া ইত্যাদি হয়।

শরীরের কোনো জায়গায় ঝিন্ ঝিন্ করা, সড় সড় করা; চোখের সামনে লাল নীল আলোর ঝলকানি হওয়া; কানে হঠাৎ কোনো আওয়াজ বা কথা আসা - যখন কেউ কোথাও নেই; নাকে কোনো

পচা বা পোড়া গন্ধ পাওয়া; ঝাঁ করে মাথা ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি। এ সবই হয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য - বার বার এবং একই রকম ভাবে।

c) কমপ্লেক্স পার্সিয়াল ফিট ঃ (Complex Partial Fit) ঃ

এই ধরনের রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করেন - অল্প সময়ের জন্য - যা পারে মনে করতে পারেন না - কিন্তু পুরো অজ্ঞান হয়ে পড়েও যান না। যেমন ঘাড় মুখ বেঁকে কিছু অর্থহীন শব্দ বলতে থাকা, হাত কচলানো, মুখ ভ্যাঙ্গানো, মুখ মোছা, হাঁসা ঝাঁদা, জলে আগুনে সোজা চলে যাওয়া, ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি।

ফিট না হলেও এইসব ধরনের লক্ষন দেখা দিলে তা মৃগী হতে পারে বুঝেযত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

☛ মৃগী রোগের ঔষধ মানসিক চিকিৎসাতেও ব্যবহার হয় ঃ-

-মৃগী রোগের প্রায় সব ঔষধই মানসিক রোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষ; এমনকি কিছু চিকিৎসকও মানসিক রোগীর প্রেশক্রিপশানে এই সব ঔষধ দেখলে বিভ্রান্ত হন- এমনকি ভুল করে মৃগীর ঔষধ দেওয়া হচ্ছে বলে - চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। এতে মনোচিকিৎসার ক্ষতি হয়। আসলে একই ঔষধের অনেক ব্যবহার আছে -তা জানার জন্য নিত্য নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় - সাধারণ মানুষ এমনকি চিকিৎসকদেরও - নইলে বিভ্রান্তি বাড়ে ।

☛ মনোরোগের ঔষধে রোগী পঙ্গু হয় না ঃ-

মনোরোগের ঔষধের কিছু ক্ষেত্রে সাইড এফেক্টস (Side effects) হাত পা কাঁপা , খাঁচা হয়ে যাওয়া লালা পড়া ইত্যাদি হয় - যাকে বলা হয় এক্সট্রা পি রামিডিয়াল সিনড্রোম (Extra Pyramidal Syndrome)। আবার কখন কখন ঘাড় বাঁকে , চোখ উপরে উঠে যায় , জিভ বেড়িয়ে

আসে - যাকে বলে ডিসটোনিয়া (Dystonia) । সাধারণতঃ Haloperidol , Trifluoperazine ইত্যাদি গ্রুপের ঔষধে এই রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। সেই কারনে এই সব ঔষধের সাথে সাইড এফেক্টস (Side effects) কাটানোর ঔষধ দেওয়া হয়। অনেক সময় রোগী হঠাৎ ঔষধ বন্ধ করলে বা ঠিক ভাবে না খেলে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। তবে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই । সামান্য ঔষধ প্রয়োগে তা সহজেই আয়ত্তে আনা যায়। এই সাইড এফেক্টস (Side effects) ক্ষনস্থায়ী (temporary) ; চিরস্থায়ী (permanent) নয়। অনেকেই এই গুলোকে প্যারালাইসিস (Paralysis) ভেবে আতঙ্কিত হন এবং চিকিৎসা বন্ধ করে দেন । এটি ভ্রান্ত ধারণা। মনোরোগের কোনো ঔষধে রোগী পঙ্গু হয় না - এটা জানা তাই খুবই জরুরী।

☛ কুসংস্কার- মেয়েলি বিশ্বাস নয় ঃ-

ওঝা, গুনীন, ঝাড় ফুক দৈব্য চিকিৎসাকে অনেকেই মেয়েলি বিশ্বাস বা মেয়েলি মতে চিকিৎসা বলেন। হাতে অংটি, তাবিজ পরে পুরুষেরা বলেন যে তিনি নিজে বিশ্বাস করেন না শুধু মা বা স্ত্রীর অনুরোধে পরেছেন। চন্দ্রায়ন যজ্ঞের বিশাল খরচ করেও পুরুষেরা বলেন যে শুধু মাত্র বাড়ীতে মেয়েদের মনশান্তির জন্য এসব করেছেন। আসল সত্য হলো - কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস - পুরুষ ও নারী মধ্যে সমান ভাবেই থাকে। সিরিয়াস রোগীর ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ রেখে তুক তাক করানোতে বাড়ীর পুরুষদেরও সমর্থন থাকে। শুধু মাত্র সমালোচনা এড়াবার জন্য সব দোষ মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। কাজেই সমাজ কুসংস্কার মুক্ত করতে শুধু মহিলা নয়, পুরুষদের সমান ভাবে আলোচনার মধ্যে রাখতে হবে।

☛ জনসচেতনা ভিন্ন স্বাস্থ্যবান জাতি গড়া সম্ভব নয় ঃ-

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চিকিৎসাস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। AIDS, Cancer ও মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি রোগ ছাড়া বাকি সমস্ত রোগের

নিরাময় সম্ভব । যে সমস্ত রোগের নিরাময় হয় না - তাদের নিদেন পক্ষে দমিয়ে কষ্ট লাঘব করার চিকিৎসা আছে। ত্রুটি মুক্ত না হলেও জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার অনেক প্রসার ঘটানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রোগ নির্মূল কর্মসূচী - যেমন পোলিও , যক্ষ্মা , কুষ্ঠ , ম্যালেরিয়া, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদিও বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থাও সহজলভ্য করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যে খুব একটা উন্নতি হয়নি। আজও ভারতে TB ও Infectious Disease -এ সর্বাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। ডায়বেটিস ও হৃদরোগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে । মানসিক রোগী আশি শতাংশ ক্ষেত্রে বিনা চিকিৎসাতেই আছেন ।

আসলে চিকিৎসাব্যস্থার উন্নতি বা সহজলভ্যতা হলেও সমাজে তার সুফল পাওয়া যায় না) যদি সাধারণ মানুষ তা না গ্রহণ করেন। জনগণ যদি রোগ সম্বন্ধে জানতে না পারেন , আধুনিক চিকিৎসায় বিশ্বাস বা আস্থা না রাখেন, কুসংস্কার ও ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দিকে ঝুকে থাকেন - তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের হাজারো উন্নতির বাস্তব প্রয়োগ পাওয়া যাবে না। তাই চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি - সমাজ - সংস্থা - রাজ্য - রাষ্ট্র - সবাইকে সর্বাগ্রে চেষ্টা করতে হবে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে । পত্র-পত্রিকা, রেডিও , টিভি, ইন্টারনেট , সেমিনার, সভা , স্লোগান , পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা তৃণমুল স্তরে পৌছাতে চিকিৎসাকারীদের রোগীর কাছে পোঁছতে হবে— রোগীর চিকিৎসককের কাছে আসার অপেক্ষায় থাকলে অবস্থার উন্নতি হবে না।